রামায়ণের উল্লেখ ঃ ৪। "রামায়ণ মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দুঃখ-সঙ্গীত। তবে বৈরাগ্য-অবলম্বন ইহার উপদেশ নহে" ('সুখ না দুঃখ')। "অমঙ্গলের জয়বার্তা গীত হইয়াছে। রামায়ণের আদি কবি সেই গীতি গাহিয়াছেন। ভারতের ইতিহাস সেই গীতের প্রতিধ্বনি" ('অমঙ্গলের উৎপত্তি')।

নৈয়ায়িক ভঙ্গী ঃ ৫। "এক বল, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্; তাহা হইলে তিনি দয়াময় নহেন। অথবা বল, তিনি দয়াময়; তাহা হইলে তিনি পূর্ণশক্তি নহেন" (ঐ)।

৬। ভক্ত-প্রেমিক-দার্শনিকদের মঙ্গলের সপক্ষে নিজস্ব ধারণার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতাকে ব্যঙ্গ করার বিরুদ্ধে উষ্মা ও প্রতিক্রিয়া—"তিনি আমার মত হতভাগ্যকে কৃপা করুণ; কিন্তু সংসার বিষে জর্জরিত আমার নিকট অমঙ্গলের অস্তিত্ব অপলাপ করিয়া আমাকে বিদ্রূপ করিলে তাঁহার সহৃদয়তায় আমি বিশ্বাস করিব না ('অমঙ্গলের উৎপত্তি')।

'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থভুক্ত 'অমঙ্গলের উৎপত্তি' প্রবন্ধটি প্রায় আদ্যন্ত চড়া সুরে বাঁধা। প্রবন্ধের প্রথমেই ভূমিকম্পে মৃত্যু উপলক্ষ্যে মঙ্গলময় ঈশ্বরের বিধানের ব্যাখ্যাতাদের উপলক্ষে লেখক ব্যঙ্গযুক্ত বাক্যে তাদের মনোভাব বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন কোনো নিরীহ ব্যক্তির "মাথা চেপ্টা করিয়া দিয়া তাহার অনাথা পত্নীর অন্নের সংস্থান বন্ধ করা হইল কেন" সংশয়বাদীর এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তথাকথিত মঙ্গলপন্থী মানুষেরা এইভাবে ঃ "সে ব্যক্তি না হয় নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক ছিল, কিন্তু তাহার পত্নীর কথা কে জানে? অথবা তাহার দোষ না থাকুক, তার বাপের দোষ ছিল, অথবা পিতামহের দোষ ছিল; অথবা এ জন্মে দোষ না থাক, পূর্ব্বজন্মে দোষ ছিল না, তাহা কে বলিল?" তারপরই ব্যঙ্গ তুঙ্গে উঠেছে (পরের অংশেই) "ব্যাঘ্র মেষশাবককেও ঠিক এইরূপ বলিয়াছিল।"

কিম্বা মঙ্গলময় ঈশ্বরের মানুষের জন্য বিচিত্র দ্রব্য সৃষ্টির আয়োজনকে ব্যঙ্গ করে ঃ (মঙ্গলবাদীদের বক্তব্যকে) "তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন, স্তুতিভাজন ও প্রীতিভাজন; কেন না, তাঁহার রচিত জগতের মধ্যে আমরা এত স্ফূর্তি সহকারে বেড়াইতেছি। অতএব গাও হে তাঁহার নাম" ইত্যাদি।

বিপরীতভাবে, তাঁর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' গ্রন্থটি প্রধানতঃ স্বাদেশিকতার ব্রত-দীক্ষায় সমৃদ্ধ; স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে কবিত্বের ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে ভাষা হয়ে উঠেছে ভক্তের নমনীত আবেগে পরিপূর্ণ ঃ "মা লক্ষ্মী কৃপা কর। কাঞ্চন দিয়ে কাচ নেব না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পরবো না। ঘরের থাকতে পরের নেব না।" রামেন্দ্রসুন্দরের 'চরিতকথা' গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে মনীষীদের জীবন-চিত্রায়ণের এক অমূল্য সংযোজন। এখানে আছে আটজন মনীষীর জীবনী চিত্র ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, হর্মান হেলম্‌হোল্যজ, আচার্য মক্ষমূলর, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, রজনীকান্ত গুপ্ত এবং বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিষয়ের ভাব এখানে ভাষার লাবণ্যে কমনীয় হয়ে উঠেছে। এই গাম্ভীর্য ও কমনীয়তার গুণেই রামেন্দ্রসুন্দর রমণীয়।

■ প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮ খ্রীঃ - ১৯৪৬ খ্রীঃ) ■

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আকাশে প্রমথ চৌধুরী এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে দেদীপ্যমান। তিনি পাবনার হরিপুর গ্রামের এক প্রসিদ্ধ জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা, ইন্দিরা দেবীর স্বামী, ব্যারিস্টার প্রমথ চৌধুরী

বিংশ শতকের বাঙালী বুদ্ধিজীবী মহলে এক স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ., ফরাসী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন এই বিদগ্ধ মানুষটি। তাঁর রচনা শাণিত স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। wit ও paradox-এর অফুরন্ত ধারায় তাঁর সাহিত্যকর্ম প্রণোদিত, "He wrote thus because he thought thus. He wrote thus because he could not write otherwise" চেস্টারটনীয় স্টাইলের আলোচনায় ক্রিস্টোফার হেলিসের এই সত্যোচ্চারণ সম্ভবতঃ ভারতীয় লেখকদের মধ্যে তাঁর সম্পর্কেই সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য। বিংশ শতাব্দীর নাগরিকতার ভাষ্যকার এই প্রাবন্ধিক 'বীরবল' ছদ্মনামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর সাহিত্য বীরবলী-সাহিত্য এবং তাঁর স্টাইল 'বীরবলী-স্টাইল' নামেও সুপরিচিত। প্রকৃতপক্ষে এইদিক থেকে সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী 'বাঙালী জাতির বিদূষক' হিসাবেও খ্যাতিমান। এ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন ঃ

"আমি যখন দেশের লোককে রসিকতাচ্ছলে কতকগুলি সত্য কথা শোনাতে মনস্থ করি তখন আমি না ভেবে চিন্তে বীরবলের নাম অবলম্বন করলুম।"

কিন্তু শুধুমাত্র বীরবল ছদ্মনামের আড়ালে হাস্য-পরিহাসে নয়, 'সবুজপত্র' পত্রিকার সম্পাদক, চলিত ভাষার প্রচারক, সনেটকার, ছোটোগল্পকার, প্রাবন্ধিক ইত্যাদি বিভিন্ন ভূমিকায় প্রমথ চৌধুরীর কৃতিত্ব দেখা যায়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও সাহিত্যজীবনের অনন্যতায় মুগ্ধ হয়ে সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন ঃ

"সব্যসাচী প্রমথ চৌধুরী, 'সবুজপত্র' তাঁর গাণ্ডীব। আর সবুজ-সভার সভ্যরা পাণ্ডব-সেনার দল।... রুচির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বররুচি, রূপের রাজ্যে তিনি ছিলেন বরপুত্র, জ্ঞানের পথে তাঁকে বলা যায় বরযাত্রী। রূপোর চেয়ে রূপকে, রূপের চেয়ে রুচিকে, রুচির চেয়ে ঋদ্ধিকে বড়ো মনে করতেন তিনি। তাঁর সাহিত্য-প্রতিভায় নব্যতা ছিলো—ছিলো অনন্যতা" ('সাহিত্য ও সাহিত্যিক')।

বাস্তবিক, তাঁর মননের মধ্যে যেমন ছিল ফরাসী মেজাজ তেমনি তাঁর মন ছিল ভারতীয় রসবোধে সঞ্জীবিত, আর সবার উপরে ছিল উচ্চচূড় ইন্‌টেলেকট্‌-এর দীপ্তি। তাঁর দৃষ্টি ছিল science-এ, তাঁর নীতি "the proper study of mankind is man"; আর রীতি হল 'of a conscious search for ordered beauty'। তাই তাঁর মধ্যে দেখা যায় ক্ল্যাসিক প্রীতির সঙ্গে নির্মোহ আধুনিকতা, কলাকৈবল্যবাদী প্রত্যয়ের সঙ্গে কলাকারের নিখুঁত প্রকাশভঙ্গি, বহুশ্রুত ভাবের সঙ্গে ভাষার চাবুক। তিনি মননশীল হয়েও জীবনরসিক।

■ রচনাসমূহ ■

প্রমথ চৌধুরীর প্রথম প্রবন্ধ 'জয়দেব' প্রকাশিত হয় 'সাধনা' পত্রিকায় (১৮৯৩)। তাঁর অন্য গদ্য প্রবন্ধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) **প্রবন্ধ গ্রন্থ ঃ** 'তেল-নুন লকড়ি' (১৯০৬), 'বীরবলের হালখাতা' (১৯১৭), 'নানা কথা' (১৯১৯), 'আমাদের শিক্ষা' (১৯২০), 'দু-ইয়ার্কি' (১৯২১), 'বীরবলের টিপ্পনী' (১৯২১), 'রায়তের কথা' (১৯২৬), 'নানা চর্চা' (১৯৩২), 'ঘরে বাইরে' (১৯৩৬), 'প্রাচীন হিন্দুস্থান' (১৯৪০), 'বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়' (১৯৪৪), 'আত্মকথা' (১৯৪৬) এবং 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান' (১৯৫৩)।

(২) **গল্পগ্রন্থ ঃ** 'চার ইয়ারী কথা' (১৯১৬), 'আহুতি' (১৯১৯), 'নীললোহিত' (১৯৩২), 'গল্প সংকলন' (১৯৪১)।

(৩) **কাব্যগ্রন্থ ঃ** 'সনেট পঞ্চাশৎ' (১৯১৩) এবং 'পদচারণা' (১৯১৯)।

দর্শন-রাজনীতি-সংস্কৃতি-ইতিহাস-ভাষা ও সাহিত্য, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে তাঁর অবাধ বিচরণ ও পাণ্ডিত্য যেমন দেখা যায়, তেমনি আছে উপযুক্ত ভাষায় তাকে প্রকাশের চাতুর্য। তাঁর প্রবন্ধগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য ঃ (ক) প্রগতিশীল যুক্তিবাদীতা, (খ) মননপ্রধান চিন্তা ভাবনা (গ) তির্যক বাচনভঙ্গী এবং অলঙ্কারের বাক্‌বিন্যাস, (ঘ) নাগরিক বৈদগ্ধ।

(৪) পত্রিকা সম্পাদনা ঃ 'সবুজপত্র' (১৯১৪ খ্রীঃ) সম্পাদনার পূর্বে 'ভারতী' (১৯০২ খ্রীঃ) পত্রিকার মাসকাবারি লেখায় 'বীরবল' নামে প্রমথ চৌধুরী চলিত ভাষার সপক্ষে লিখতে শুরু করেন। তির্যক ব্যঙ্গে বলেন ঃ

"ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়। উল্টোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে।" (বীরবলের হালখাতা ঃ 'কথার কথা')

রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর কবিতাকে বলেছিলেন 'ইস্পাতের ছুরি' (চিঠিপত্র ১৫ সংখ্যক পত্র, ২২.৪.১৯১৩)। তাঁর গদ্যের মধ্যেও আছে সেই শাণিত দীপ্তি। প্রমথ চৌধুরীই বাংলা ভাষায় প্রথম প্রবন্ধ-লিখিয়ে যিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রণোদনায় কিম্বা দেশাত্মবোধের আবেগে কলম ধরেননি। তাঁর অভিমত ঃ "আমি রূপায়িত করি শুধু নিজেকে, আমার রচনার বিষয় আমি নিজে"। করুণ আবেগে আর্দ্র বাংলাদেশের জলীয় পরিবেশে তিনিই প্রথম সুস্থ শুষ্ক সতেজ মনের ভাবনা প্রকাশ করলেন, তাঁর ভাবনা ও রচনার বিস্তার বহু বিষয়স্পর্শী, কিন্তু তাঁর সমধিক কৃতিত্ব বাচন-রূপায়ণে। একথা হয়ত সত্য, যে তাঁর বাচন-বৈশিষ্ট্য অনেক সময় তাঁর মনন বা সিদ্ধান্তের উপরে স্থান নিয়েছে। তবু তাঁর মনোহারিত্ব অনস্বীকার্য। এই ধরনের কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায় ঃ

ভাষারীতি বা স্টাইল ঃ "মন্ত্র সাপকে মুগ্ধ করতে পারে কি না জানি নে, কিন্তু মানুষকে যে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ গোটা ভারতবর্ষ।" ('সবুজপত্রে মুখপত্র')

"সুন্দরের আগমনে হীরা মালিনীর ভাঙা মালঞ্চে যেমন ফুল ফুটে উঠেছিল, ইউরোপের আগমনে আমাদের দেশে তেমনি সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠেছে। তার ফল কি হবে সে কথা না বলতে পারলেও এই ফুল ফোটা যে বন্ধ করা উচিত নয়, এই হচ্ছে আমাদের দৃঢ় ধারণা।" ('পূর্বোক্ত')

"জ্ঞানের ভাণ্ডার যে ধনের ভাণ্ডার নয়, এ সত্য তো প্রত্যক্ষ, কিন্তু সমান প্রত্যক্ষ না হলেও এও সমান সত্য যে, এ যুগে যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য, সে জাতির ধনের ভাঁড়েও ভবানী"। ('বইপড়া')

কখনো বা ফরাসী বাগ্‌ভঙ্গির অনুসরণে লেখা হয় ঃ

"কিন্তু সমালোচকেরা চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়ে দিলেও বঙ্গসরস্বতী আর গোবিন্দ অধিকারীর অধিকারভুক্ত হবেন না এবং দাশরথিকেও সারথি করবেন না।"

এই ধরনের বুদ্ধি-প্রধান বাগ্‌ভঙ্গী ফরাসী প্রাবন্ধিক Montaigne (বা মতেঞ্-১৫৩৩ খ্রীঃ-১৫৯২ খ্রীঃ) লিখেছেন ঃ

"C'est moi que je peins...Je Suis moi-meme la matiere de mon livre.." ইত্যাদি।

প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ প্রবন্ধের বক্তব্যই বিতর্কমূলক। হয় প্রাচীন না হয় নবীন, প্রচলিত অথবা প্রচারিত মতকে পরীক্ষা করে প্রায় তার উচ্ছেদ করাই এর লক্ষ্য। এই পরীক্ষায় আছে যুক্তি ও তর্কের বিচার, দেশী ও বিদেশী তথ্য ও তত্ত্বের বহু আলোচনা।

তবে বক্তব্য-বিষয় নয় "যা প্রথম থেকে পাঠকের মনকে সজাগ ও মুগ্ধ রাখে সে হচ্ছে বিচার ও আলোচনার প্রকাশের ভঙ্গি" (প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' প্রথম খণ্ড, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১০)।

একথা অনস্বীকার্য, বাংলা গদ্যের চলিত রীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনে প্রমথ চৌধুরী এবং তাঁর সম্পাদিত 'সবুজপত্রে'র ভূমিকা ছিল সর্বাগ্রে। কিন্তু কেবল নেতৃত্বদানের জন্যই নয়, এক স্বতন্ত্র ভাষা-রীতির স্রষ্টা রূপেও চৌধুরী মশাইয়ের অবদান ছিল অসামান্য। wit, paradox, epigram-এর দৃষ্টান্ত তাঁর রচনায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। তাঁর ভাষারীতির মধ্যে আছে (ক) আলঙ্কারিকতা ও উপমা ব্যবহারে অভিনবত্ব, (খ) স্পষ্টতা ও সত্যবাদিতা, (গ) ব্যঙ্গধর্মী বুদ্ধিদীপ্ত মানসিকতা, (ঘ) ঋজুতা ও শাণিত বাক্‌ভঙ্গি। তাঁর রচনা "witty as well as satiric." উইটের ব্যবহারে তাঁর ভাষারীতির মধ্যে যেমন একদিকে এসেছে ইস্পাতী উজ্জ্বলতা, অন্যদিকে উপেক্ষিত সত্যের মূর্তি বলার গুণে বিমুখ পাঠকের কাছেও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে ঠিক যেন চেস্টারটনের ভাষায় "Truth standing on her head to attract attention." স্বভাবতই তাঁর প্রবন্ধে পড়ে পাঠকের মনে হয় "কথা বলাকে এখানে তিনি কথা কলায় পরিণত করেছেন" ('বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী', রথীন্দ্রনাথ রায়)।

বিষয়ের দিক থেকেও কমলাকান্তের মন বহুস্পর্শী। এখানে 'বিড়ালে'র মুখ দিয়ে সূতীক্ষ্ণ শ্রেণীবৈষম্যের ব্যাখ্যা যেমন লভ্য, তেমনি আছে ভাবাবেগের উত্তাপ। রিচার্ড জে ফারিঙ 'the pegions at the British Museum' রচনায় মিউজিয়ামের সামনে সূর্যের আলোয় উপবিষ্ট পায়রাগুলির বর্ণনা করেছিলেন এইভাবে ঃ "In the sunshine, by the shady verge of woods, by the waters where the wild dove sips, their alone will thought be found."

আর কমলাকান্ত 'ফুলের বিবাহ' সংবাদ দেয় এইভাবে ঃ

"গোলাব তখন বাতাসের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা করিতেছিল, বিবাহের নাম শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া কন্যার বয়স জিজ্ঞাসা করিল। ভ্রমর বলিল, 'আজ কালি ফুটিবে'।"

এই চিত্ররূপ কমলাকান্তের শিল্পী-মনকেই প্রকাশ করে।

গদ্যরীতি ঃ শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের লক্ষণ ঃ "Is a kind of lucky dip into the experience or into fantasy–often into both. The ordinary essayist dips again and again, and seldom brings up anything worth showing to his neighbours." (Lind). কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র "dipped again and almost invariably come back with a percel of treasure." প্রচ্ছন্ন পরিহাসরস, ভাষার প্রসাদগুণ, কাব্যধর্মিতা বঙ্কিম-প্রবন্ধের কালজয়িতার স্মারক। (ক) শব্দচয়নে উদারতা ও পরিমিতিবোধ তাঁর গদ্যে লক্ষ্য করা যায়। আবার শব্দমোহ ও প্রগতিমাধুর্যের বিপদ থেকে আত্মরক্ষার প্রবণতাও দেখা যায়। (খ) দুরচ্চার্য শব্দ, বৃথা অনুপ্রাস, অস্পষ্টতা ও অর্থাভাস বর্জনের চেষ্টা আছে। (গ) প্রশ্নাত্মক বাক্য ব্যবহারের দ্বারা পাঠকমনে উৎসুক্য ও সংশয় জাগ্রত রাখার কৌশলও তাঁর গদ্যরীতির মধ্যে দেখা যায়। (ঘ) সংযোজক অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সংখ্যা হ্রাস ও সমাপিকা ক্রিয়াপদের অধিক ব্যবহারে বাক্যে দ্রুততা সৃষ্টি করা হয়েছে। (ঙ) অন্তরঙ্গ বর্ণনাভঙ্গির দ্বারা পাঠকের সঙ্গে রচয়িতার সহৃদয়-সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। (চ) নাটকীয় আকস্মিকতার দ্বারা পাঠক-চিত্তকে সচকিত করার প্রচেষ্টা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখা যায়।

■ মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭ খ্রীঃ - ১৯১২ খ্রীঃ) ■

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে সব মুসলিম লেখকগণ বাংলাভাষায় সাহিত্য রচনা করে আপনার যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন, মীর মশাররফ হোসেন তাঁদের মধ্যে সব চাইতে শক্তিমান গদ্যলেখক। তাঁর মধ্যে একাধারে নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক সত্তার সমাবেশ ঘটেছিল। মীরের সাহিত্যজীবনের সূচনা হয় 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার পাতায়। এখানে 'কুষ্ঠিয়ার সংবাদদাতা' রূপে লেখক জীবন শুরু করেন। পরে তিনি 'আজীবন নেহার' নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর কর্মজীবন ফরিদপুরের নবাব এস্টেটে ও পরে দুয়ার এস্টেটে ম্যানেজার পদে অতিবাহিত হয়।

জন্ম ও কর্মজীবন ঃ ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর (বঙ্গাব্দ ১২৫৪, কার্তিক ২৮) নদীয়া জেলার অন্তর্গত লাহিনীপাড়া গ্রামে মীর মশাররফের জন্ম হয়। পিতা মীর মুয়াজ্জম হোসেন, মা বিবি দৌলতন্নেসা। মশাররফ পিতার দ্বিতীয় পক্ষের প্রথম সন্তান। রাজকার্যে যোগ্যতা ও পারদর্শিতার জন্য এঁরা 'মীর' উপাধি লাভ করেন। আসলে এঁদের বংশগত উপাধি ছিল 'সৈয়দ'।

বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মীরের জীবন সংগঠিত হয়। শৈশবে মুন্সী সাহেবের কাছে আরবী শিক্ষার এবং জগমোহন নন্দীর পাঠশালায় বাংলা পঠন-পাঠন শিক্ষার সূচনা হয়। বয়সকালে ফারসি ভাষার সঙ্গেও পরিচয় ঘটে। চৌদ্দ বছর বয়সে কুমারখালি ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন। প্রচলিত কুসংস্কারের বাধা ছিল। মীরের নিজের ভাষায় ঃ 'ইংরেজী পড়িলে পাপ ত আছেই। আর মুখে আসিবে না।... ইংরেজী পড়িলে একরূপ ছোটখাটো শয়তান হয়'' (উদ্ধৃত, 'বিষাদ-সিন্ধু', ভূমিকা, 'আমার জীবনী', পৃষ্ঠা ৮-৯)। কুমারখালি স্কুলে স্বল্পকালীন অবস্থানের পর পদমদী নবাব স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু সংসর্গদোষে পড়াশুনো বেশিদূর এগোয় না। তারপরে ভর্তি হন কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে। এখানে মাত্র সাত মাসের জন্য তাঁর অবস্থান ঘটে। কিন্তু তার প্রভাব হয় গভীরতর। এখানকার হিন্দুয়ানী চালচলন, হিন্দুয়ানী নামকরণ তাঁকে হিন্দুজীবন সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে। কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় পিতৃবন্ধু নবাজীর সাহেবের বাড়িতে স্থানান্তরিত হন। সেখানে নবাজীরের জ্যেষ্ঠা কন্যা লতিফ-উন্-নিসার সঙ্গে প্রণয়-সম্পর্ক গড়ে উঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর বিবাহ হয় লতিফের বোন আজীজ-উন্-নিসার সঙ্গে, যা তাঁর ভবিষ্যত জীবনকে বিষময় করে তোলে। ১২৮০ খ্রীঃ তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয় কুলসমের সঙ্গে। এই বিবি কুলসমই মশাররফের উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে সংযত ও সৃষ্টিশীল করে তোলেন। এই দ্বিতীয়া পত্নী কুলসমকে নিয়েই মীর তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ 'বিবি কুলসম' রচনা করেন। কুলসমের মৃত্যুবর্ষে এটি প্রকাশিত হয়। কুলসমের মৃত্যুর দু'বছর পর মীর সাহেব পরলোকগমন করেন।

■ রচনাসমূহ ■

মীর মশাররফের রচনাগুলিকে (ক) নাটক, (খ) উপন্যাস, (গ) জীবনী-মূলক রচনা এবং (ঘ) পত্রিকা সম্পাদনা এই কয়টি ভাগে উল্লেখ করা যায়।

প্রথম শ্রেণীর মধ্যে আছে ঃ 'বসন্তকুমারী' নাটক (১৮৭৩), 'জমিদার-দর্পণ' (১৮৭৩), 'এর উপায় কি' (১৮৭৫) প্রহসন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে আছে ঃ 'রত্নাবতী' (১৮৬৯), 'বিষাদসিন্ধু' (প্রথম খণ্ড ১৮৮৫, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৭, তৃতীয় খণ্ড ১৮৯১), 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০), 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' (১৮৯৯)।

তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে আছে—'গোরাই ব্রীজ' বা গৌরী সেতু (১৮৭৩) নামক কবিতা, 'সঙ্গীতলহরী' (১৮৮৭), 'বেহুলা গীতাভিনয়' (১৮৮৯), 'গো-জীবন' (১৮৮৯), 'গো রক্ষার জন্য প্রস্তাব', 'হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ' (১৯০৫), 'মদিনার গৌরব' (১৯০৬), মোস্লেম বীরত্ব (১৯০৭), 'মোস্লেম ভারত' (১৯০৭), 'আমার জীবন' (১৯০৮), 'এসলামের জয়' (১৯০৮) গদ্যরচনা ও 'বিবি কুলসম বা আমার জীবনীর জীবনী' (১৯১০) প্রভৃতি।

চতুর্থ কাজ 'আজীবন জেহাব' (১৮৭৪) নামে পত্রিকা সম্পাদনা। এই পত্রিকার আদর্শ ছিল 'হিন্দী-পারসী কলঙ্কিত আদালতী বাঙ্গালার' পরিবর্তে 'মধুময় বাঙ্গালা ভাষার যথার্থ স্বাদ'-এর সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় ঘটানো।

মীর সাহেবের রচিত নাটকগুলির মধ্যে রচনাশক্তির উৎকৃষ্টতা যেমন দেখা যায়, তেমনি তাঁর সমাজ-সচেতনতার স্বাক্ষর আছে, বিশেষত 'জমিদার দর্পণ' রচনায়। 'নীলদর্পণ' এই গ্রন্থের পূর্বপ্রেরণা সন্দেহ নেই। তবু বাংলাদেশে প্রজাসাধারণের উপর জমিদারের অত্যাচারের এমন বাস্তব ও দুঃসাহসী চিত্র বাংলা সাহিত্যে বিরল। নাট্যকারের উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের গুণেও গ্রন্থটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

'জমিদারের-দর্পণে' নাট্যকারের মূল লক্ষ্য, প্রজার উপর জমিদারের অত্যাচার, শোষিতের উপর শোষকের নিষ্ঠুর অত্যাচারের চিত্রাঙ্কন। নাটকের প্রস্তাবনায় আছে এই দুঃসাহসিক চিত্রাঙ্কনের প্রতিশ্রুতি ঃ

"সূত্রধার—' (ক্ষণকাল নিস্তব্ধে) আচ্ছা মফস্বলে এক রকম জানওয়ার আছে জানেন? তারা কেউ কেউ শহরেও বাস করে, শহরে কুকুর কিন্তু মফস্বলে ঠাকুর! শহরে তাদের, কেউ জানে যে এ জানওয়ার বড় শান্ত—বড় ধীর, বড় নম্র; হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, মনে দ্বিধা নাই, মাছ মাংস ছোঁয় না। কিন্তু মফস্বলে শ্যাল, কুকুর, শূকর, গরু পর্যন্ত পার পায় না! বলব কি, জানওয়ারেরা আপন আপন বনে গিয়ে একেবারে বাঘ হয়ে বসে" (আব্দুল আজীজ আল্-আমান সম্পাদিত 'জমিদার-দর্পণ', প্রস্তাবনা, পৃষ্ঠা ২৮৯)।

বস্তুত, জমিদারদের মাত্রাতিরিক্ত খাজনা-বৃদ্ধি এবং ইচ্ছেমত প্রজা-উচ্ছেদের বিরুদ্ধে পাবনা এবং বগুড়ায় হিন্দু-মুসলমান কৃষকেরা ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে সম্মিলিতভাবে বিদ্রোহ করে। প্রায় ছয় বছর ধরে তা অব্যাহত থাকে। বাস্তব ঘটনাবলীর আলোকে মীর সাহেবের 'জমিদার দর্পণে'র চরিত্রেরা তারই কায়ারূপ লাভ করে। এই গ্রন্থটির ভাষারীতি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা অর্জন করেছিল ঃ "জনৈক কৃতবিদ্য মুসলমান কর্তৃক এই নাটকখানি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় প্রণীত হইয়াছে। মুসলমানী বাঙ্গালার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই। বরং অনেক হিন্দুর প্রণীত বাঙ্গালা অপেক্ষা এই মুসলমান লেখকের বাঙ্গালা পরিশুদ্ধ।" কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই গ্রন্থের বৈপ্লবিক সমস্যার অবতারণা 'সাহিত্যসম্রাটে'র সমর্থন পায় নি ঃ "...আমরা পাবনা জিলার প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত এবং বিষাদযুক্ত হইয়াছি। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজনীয়। আমরা পরামর্শ দিই যে, গ্রন্থকারের এসময়ে এ গ্রন্থ বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা কর্তব্য" (উদ্ধৃত, 'বিষাদ-সিন্ধু', পূর্বোক্ত, ভূমিকা, পৃষ্ঠা, ১৮)। এর মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সামন্ততন্ত্রের প্রতি সমর্থন প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ পায়। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র 'নীলদর্পণে'র প্রকাশকেও প্রথমে সমর্থন করতে পারেন নি।

নীলদর্পণ ও জমিদার-দর্পণ ঃ ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে নীলকরদের নির্মম অত্যাচারের বিবরণ প্রকাশিত হয় 'নীলদর্পণে'। এই ধারায় পরবর্তীকালে বেশ কিছু নাটক লেখা হয়; যেমন—জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখকের 'সাক্ষাৎ দর্পণ' (১৯৭১) ধরা পড়েছে বাঙালী সমাজের কদাচার, প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের 'পল্লীগ্রাম দর্পণ' (১৮৭৩), যোগেন্দ্র ঘোষের 'কেরাণীর দর্পণে' (১৮৭৪) ফুটে উঠে কেরাণী সমাজের চিত্র। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'চা-কর দর্পণে' চা-বাগানের কুলীদের উপর নির্যাতনের ছবি, উৎপীড়িত জেল কয়েদীদের চিত্র প্রকাশিত হয় 'জেল দর্পণে' (১৮৭৫)। তবু বলা যায়, এই দর্পণালেখ্য-সাহিত্যধারায় 'নীলদর্পণ' অদ্বিতীয় হলেও 'জমিদার-দর্পণের' স্থান নিঃসন্দেহে স্মরণীয়।

'নীলদর্পণ' এবং 'জমিদার-দর্পণে' কিছু সাদৃশ্য আছে যেমন, তেমনি পার্থক্যও কম নয়। 'নীলদর্পণে' পদী ময়রাণীর মতো 'জমিদার-দর্পণে'ও আছে কৃষ্ণমণি নামে বৈষ্ণবী কুট্টনী নারী। আবার রোগের দ্বারা যেমন ক্ষেত্রমণি ধর্ষিতা হয়েছে, তেমনি হায়ওয়ানের (যার মুসলিম অর্থ 'পশু') কামপ্রবৃত্তির বলি হয়েছে নুরুন্নেহার নামে কৃষক রমণী (আবু মোল্লার স্ত্রী)। নবীনমাধব এবং আবু মোল্লার মধ্যে মানসিক যন্ত্রণাভোগের দিক থেকে কিছুটা নৈকট্য আছে। কিন্তু এই সাদৃশ্য সামগ্রিক নয়। কারণ, 'নীলদর্পণে' ক্ষেত্রমণির যন্ত্রণাক্লিষ্ট হাহাকার 'জমিদার-দর্পণে' নুরুন্নেহার ক্ষীণ কণ্ঠে উপস্থাপিত। আবার নবীন-

মাধবের দীর্ঘতর ভাষণ অপেক্ষা আবু মোল্লার সংযত কথাবার্তা অনেক বেশি বেদনাবহ। 'নীলদর্পণের' সংলাপের আড়ষ্টতা 'জমিদার-দর্পণে' নেই। এখানে ভদ্র এবং কৃষক-চরিত্রের মুখে গতিময় সংলাপ দেখা যায়। কিন্তু জজ-ডাক্তারের কথাবার্তা বা মোসাহেবদের সংলাপের স্থূলতা ও গ্রাম্যতা 'নীলদর্পণে' অনেক কম। এই দুই নাটকে নাট্যকারদ্বয়ের মনোভঙ্গীর মধ্যেও পার্থক্য আছে। 'নীলদর্পণে' অত্যাচারের সার্বিক চিত্রণের সঙ্গে প্রতিবাদের কণ্ঠও সোচ্চার—তোরাপ যার নিখুঁত নিদর্শন। কিন্তু 'জমিদার-দর্পণে' অত্যাচার নিপীড়নের চিত্র থাকলেও কোথাও কোন বজ্রমন্থ প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ নেই। নাট্যকারের নৈরাশ্যময় মনোভঙ্গীর প্রকাশ নাট্য-সমস্যার সমাধান-নির্দেশে সাহায্য করে না। এই নাটকে আরও কিছু ত্রুটি দেখা যায়; যেমন—(ক) নট-নটী-সূত্রধরের দ্বারা নাটক সূচনা ও সমাপ্তির মধ্যে প্রাচীন রীতির অনুসরণ করা হয়েছে। যাত্রাসুলভ আবেগধর্মিতারও প্রকাশ ঘটেছে। (খ) মননরীতির প্রকাশ নাটকের সংলাপে বা উপস্থাপনায় লক্ষ্য করা যায় না।

প্রবন্ধগ্রন্থ ঃ 'গো-জীবন' প্রবন্ধের মধ্যে লেখক মুসলমান হয়েও এমন দুঃসাহসিক অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশ করেছেন, যা বিস্ময়কর এবং সংবেদনশীলতার পরিচায়ক ঃ

"আমি মোসলমান—গো জাতির পরম শত্রু। আমি গো মাংস হজম করিতে পারি, পালিয়া পুষিয়া বড় বলদটির গলায় ছুরি বসাইতে পারি, ধর্মের দোহাই দিয়া দুগ্ধবতী গাভী, দুগ্ধপায়ী গোবৎসের প্রাণ সংহার করিয়া পোড়া উদর পরিশোষণ করিতে পারি, কিন্তু ন্যায় চক্ষে যাহা দেখিতেছ, যুক্তি ও কারণে যাহা পাইতেছি তাহা কোথায় ঢাকিব? ...আর একটি কথা। এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু-মোসলমান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে ধর্মে ভিন্ন কিন্তু মর্মে এবং কর্মে এক। ... ধর্মে আঘাত লাগে না, গোমাংস পরিত্যাগ করিলে ঘরকন্নাও ব্যাঘাত জন্মে না। উন্নতির পথেও কাঁটা পড়ে না। প্রাণের হানিও বোধ হয়—হয় না। এ অবস্থায় গো হিংসা পরিত্যাগ করিলে হানি কি? পরিত্যাগে নিজের কোন ক্ষতি নাই, অথচ চিরসহযোগী ভ্রাতার মনরক্ষা ধর্মরক্ষা আর যাহা রক্ষা তাহা বার বার বলিব না। যাহাতে সকল দিক রক্ষা হয়, সে ত্যাগে ক্ষতি কি?" সমকালেই 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায় এ প্রবন্ধের প্রশংসা করে লেখককে সাধুবাদ জানানো হয়।

উপন্যাসগ্রন্থ ঃ মশাররফের লেখা উপন্যাসগুলি সমকালেই যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি "মহরমের উপন্যাস ইতিহাস" 'বিষাদসিন্ধু'র কাহিনী "পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মূল ঘটনার সারাংশ" নিয়ে লেখা। ইসলামী রচনা 'জঙ্গনামা' এর উৎসস্থল। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো উপন্যাস লেখার প্রয়োজনে কারবালা প্রান্তরের শোকাবহ কাহিনীর তিনি কিছু রদবদল করেছিলেন। সুখ-দুঃখে পূর্ণ মানবজীবনের শোচনীয় পরিণাম এই উপন্যাসে মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য ও ট্র্যাজেডির গভীরতায় মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। একে কেউ বলেছেন 'ধর্মীয় গ্রন্থ', কেউ বলেছেন 'ঐতিহাসিক গ্রন্থ'। কারণ ইসলামের অভ্যুদয়ের ইতিহাস-তথ্য অবলম্বনে এটি রচিত। হোসেনের সঙ্গে এজিদের যুদ্ধ, হোসেনের ছিন্ন মস্তক দামেস্কে পাঠানো, হোসেন পরিবারের অমানুষিক জলকষ্ট ভোগ প্রভৃতি ঘটনাগুলি ঐতিহাসিক। কিন্তু হোসেনের ছিন্ন শির থেকে প্রবাহিত রক্তধারায় এজিদের পরিণাম আরবী অক্ষরে লিখিত হওয়া, ঊর্ধাকাশ থেকে পড়া স্বর্গীয় জ্যোতির আকর্ষণে খণ্ডিত শিরের উপরে উঠে যাওয়া, পূর্বোঘোষিত ভবিষ্যবাণী অনুযায়ী কারবালার প্রান্তরের আকাশে-বাতাসে-বৃক্ষে-মাটিতে আশু মরণ সম্ভাবনার সহস্র ছায়াপাত ঘটা, ফোরাত

নদীতে ভাসমান অবস্থায় দুই ছিন্নশির প্রভুভক্ত পুত্রের খণ্ডিত দেহের কাছে পাত্রসহ মস্তক ধরতেই দেহ অনুযায়ী সঠিক যোগাযোগ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনাসমূহ অলৌকিকতায় আছন্ন হয়েছে। আসলে 'বিষাদসিন্ধু' ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস। ঐতিহাসিক কিছু উপাদানের সঙ্গে এখানে মিশেছে মীরসাহেবের জীবনমুখী সৌন্দর্যদৃষ্টি এবং ঔপন্যাসিকের শিল্পচেতনা। এর প্রতিটি পর্ব এবং প্রবাহে রোমান্সের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দেখা দিয়েছে ঘটনাবহুল নাটকীয়তা।

এই উপন্যাসটি অসংখ্য চরিত্রের মিলনভূমি। হাসান, হোসেন, মারওয়ান, গাজী রহমান, হানিফা, হাসনেবানু, জায়েদা, জয়নাব, কাসেম, সানিকা, আসগর ইত্যাদি। তবু এই গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে এজিদ। এজিদের লোভ-লালসা ইচ্ছা-অনিচ্ছা উত্থান-পতনের সঙ্গে 'বিষাদসিন্ধু' উপন্যাসটির কাহিনী বিবর্তিত হয়েছে। এজিদ কুশলী সুনিপুণ সৈন্যাধ্যক্ষ, কিন্তু কামনা-লালসা প্রতিরোধে অক্ষম পুরুষ। জয়নাবকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে দেখা গেছে চিত্ত-চাঞ্চল্য এবং প্রণয়-ব্যাকুলতা। তার প্রণয়-বিক্ষত আত্মপীড়ন ও দহন-অবক্ষয়ের মধ্যে মহাকাব্যের নায়কের ট্র্যাজেডির সুর অনুরণিত হয়েছে ঃ "...কে না জানিল যে দামেস্কের রাজকুমার মৃগয়ায় গমন করিতেছেন। শত সহস্র চক্ষু আমাকে দেখিতে উৎসুক্যের সহিত ব্যস্ত হইল, কেবল আপনার দুইটি চক্ষুই ঘৃণা প্রকাশ করিয়া আড়ালে অন্তর্ধান হইল। ...এ ভীষণ সমর কাহার জন্য? এ শোণিত প্রবাহ কাহার জন্য? কি দোষে এজিদ আপনার ঘৃণার্হ?" হাসানের দ্বিতীয়া স্ত্রী জায়েদা চরিত্রাঙ্কনেও মীর যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এর ভাষা ফার্সী-বহুল নয়, তৎসম শব্দ-বহুল, গীতিময় উচ্ছ্বাস ও বেদনা, নাটকীয় সংলাপের গীতিময়তায় প্রাণবন্ত; যেমন ঃ

"রে পথিক! রে পাষাণহৃদয় পথিক! কি লোভে এত ত্রস্তে দৌড়িতেছ? কি আশায় খণ্ডিত শির বর্ষার অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছ? এ শিরে—হায়! খণ্ডিত শিরে তোমার প্রয়োজন কি? সীমার, এ শিরে তোমার আবশ্যক কি? হোসেন তোমার কি করিয়াছিল? হোসেনের শির তোমার বর্শাগ্রে কেন? তুমিই বা সে শির লইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে এত বেগে দৌড়িয়াছ কেন? যাইতেছই বা কোথায়? সীমার, একটু দাঁড়াও, আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাও। কার সাধ্য তোমার গমনে বাধা দেয়? কার ক্ষমতা তোমাকে কিছু বলে! একটু দাঁড়াও। এ শিরে তোমার স্বার্থ কি? কর্তিত শিরে তোমার প্রয়োজন কি? অর্থ, হায়রে অর্থ! হায়রে পাতকী অর্থ! তুই জগতের সকল অনর্থের মূল। জীবের জীবনের ধ্বংস, সম্পত্তির বিনাশ, পিতা-পুত্রে শত্রুতা, স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য, ভ্রাতা-ভগ্নীতে কলহ, রাজা-প্রজায় বৈরীভাব, বন্ধু-বান্ধবে বিচ্ছেদ। সকল অনর্থের মূল ও কারণই তুমি। তোমার কি মোহিনী শক্তি?"

এই ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের আবেগোচ্ছ্বাস হয়ত অনুভব করা যায়। তবু এই ভাষার প্রত্যক্ষ দৃশ্যময়তা বা চিত্রগুণ, ছোট ছোট বাক্যবন্ধনে আবেগের গতি বিস্তার যে কোন সুরসিক পাঠককেই মুগ্ধ করে। সেইজন্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখেছিলেন ঃ "বিষাদসিন্ধু আমাকে বিচলিত করিয়াছিল।...সেই সিন্ধুর ভাষা বাঙ্গালী হিন্দু, লিখিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিবে।" ('সাহিত্যসাধক চরিতমালা', ২৯, গ্রন্থে উদ্ধৃত, ব্রজেন্দ্র)।

হোসেন সাহেবের অন্য উপন্যাসগুলির মধ্যে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' কৌতুককর কাহিনী। এই গ্রন্থের সমাজচিত্র সর্বস্তরের পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল।